OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 714 - 722
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের সমাজজীবনে ‘চৌদ্দ আইন’ : বিস্মৃতির একটি অধ্যায়

চৈতালী গড়াই
সহকারী অধ্যাপক
জওহরলাল নেহেরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়, শ্রীবিজয়পুরম
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারত
Email ID: chaitaligarai99@gmail.com
0009-0009-6114-7835

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Contagious Diseases, ACT XIV, Colonial Calcutta, Bengali literary works, Sex workers, Medical examinations, Social significance, British government, Chaotic situation, Harassment.

Abstract
During British rule in the nineteenth century, around 1868, a disease named Contagious Diseases spread rapidly through the brothels of Calcutta. Within a short period, the disease also spread among British soldiers, creating a chaotic situation. In response, the British government introduced the Contagious Diseases Act, commonly referred to in this context as the Contagious Diseases ACT XIV in Calcutta. Under this law, all sex workers in the city were required to visit medical hospital and undergo examinations for sexually transmitted diseases. However, these examinations were extremely painful and humiliating. Women were subjected to various medical procedures, reportedly involving the use of mercury-based substances. Many women faced serious health risks, and hospitals became places of abuse and exploitation under the pretext of medical examinations. Fearing these examinations and the accompanying harassment, many sex workers fled Calcutta. Amid this atmosphere of conflict and oppression, several newspapers and periodicals began publishing articles condemning the mistreatment of women. The issue was also reflected in contemporary literature. Several literary works were written based on the Act XIV, including ‘Bahaba Choddo Ain’, ‘Beshya Bibaran’, ‘Badmaish Jabda’, ‘Bharat Darpan’, ‘Beshya Guide’, ‘Panchali Kamalkali’ among others. These works portrayed the social conditions of contemporary Calcutta, the fear and suffering of sex workers, their tragic circumstances, their departure from the city, and incidents in which women from respectable households were allegedly taken to police stations and subjected to harassment and abuse. As oppression intensified, a number of progressive individuals, with the support of the Brahmo Samaj and women’s rights members, appealed to the British government to repeal the law. Eventually, the law was officially repealed in 1888. Gradually, the lives of the affected women began to return to normal, while the spread of the disease also declined over time. The terrible

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

consequences suffered by sex workers in Calcutta during this prolonged period of approximately twenty years were unprecedented. Although some scholars have expressed doubts about the historical authenticity of certain literary works based on the ACT XIV, their social and historical significance cannot be denied. These writings provide valuable insights into the oppression of women, the social prejudices of colonial Calcutta, and the relationship between colonial legislation and contemporary Bengali literature.

Discussion

উনিশ শতক দিনবদলের কাল, মানুষের চির-আয়েশি অবস্থা-পরিবর্তন ঘটানোর কাল। সুলতানি শাসকের হাত থেকে মুক্তি পেতে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়কে বঙ্গবাসী সাদরে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। একশো বছরের মধ্যে সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারে ক্ষিপ্ত বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহের ডাক দিলে কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার রানি ভিক্টোরিয়ার হাতে হস্তান্তরিত হয়। ভিক্টোরিয়ান শাসনব্যবস্থায় সমাজনীতির পরিবর্তনের ফলে দ্বিধাগ্রস্ত বাঙালিমন ধন্দে পড়ে। সমাজের উপর কঠিন শাসনব্যবস্থা এবং নিয়মানুবর্তিতা চালু হয়। এর প্রভাব যেমন সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় জাঁকিয়ে বসে থাকা বারাঙ্গনা সমাজের উপরও খড়্গ নেমে আসে। 'চৌদ্দ আইন' (Act XIV) নামক এক আইন প্রণয়নের দ্বারা ইংরেজ সৈন্যদলে বারাঙ্গনা নারীদের অবাধ মেলামেশায় গন্ডি টানা হয়। আসলে এই অবাধ মেলামেশায় সৈন্যদলে যৌন রোগাক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৮২৭ সালে সেনাকর্মীদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৮%, যা ১৮২৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১%। পরবর্তী ১৮৬০ সালে তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ৭০% দাঁড়ায় এবং সৈন্যদলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব যখন কোনোমতেই আটকানো সম্ভব হচ্ছে না, তখন ১৮৬৮ সালে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশিকা জারি হল - Contagious Diseases Act of 1868। ১৮৬৯ সালের এপ্রিল থেকে এই আইন কলকাতায় কার্যকরী হয়। এই আইন বারাঙ্গনাদের সামাজিক অবস্থান পাল্টে দেয়। আইন অনুযায়ী বারাঙ্গনা পল্লীর নারীদের ডাক্তারখানায় গিয়ে যৌনপরীক্ষা দিয়ে আসতে হত। এই পরীক্ষার ব্যাপারটি ছিল অতিমাত্রায় কষ্টকর। প্রথমত, জলের সঙ্গে জ্বালাকর পদার্থ মেশানো তবে মহিলাকে বসিয়ে দেওয়া হত। তারপর একটি যন্ত্র দিয়ে গর্ভদর্শন হত এবং শেষে একটি উগ্রতর উত্তেজক পিচকারি ব্যবহার করা হত। উত্তেজক হিসেবে পারা বা mercury ব্যবহার করা হত বলে এই রোগকে অনেকসময় 'পারার রোগ' বলা হত। এই উত্তেজক পারার ব্যবহার অনেক মহিলার প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়াও, এই রোগ 'ফিরিঙ্গি রোগ' নামে পরিচিত ছিল, কারণ মনে করা হত আঠারো শতকে ইংরেজরাই এই রোগ বহন করে এনেছিল, তার এই বিভীষিকাময় আইনে গণিকাদের দুরবস্থা তুলে ধরে রূপচাঁদ পক্ষী লিখলেন -

"কারে বলিব বনমালী! এ দুখের কথা।
হলো চৌদ্দ আইন বড়ো কঠিন বল যাই কোথা।।
ভেবে ভেবে গুমরে মরি এ কি আইন হলো জারী,
দিগম্বরী করবে যত বারবনিতা।"[১]

গণিকারা যৌনরোগ মুক্ত হলে তাদের রেজিস্ট্রেশন হত। অন্যদিকে, আক্রান্ত গণিকাদের 'লক হাসপাতাল'-এ পাঠানো হত। ইংল্যান্ডে হিংস্র নেকড়েদের আটকে রাখার জন্য লক হাসপাতাল ব্যবহার করা হত। ঐ হাসপাতালের আদলে বানানো এখানের হাসপাতালে রোগগ্রস্ত বারাঙ্গনাদের আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সংখ্যাতেই আইনের তীব্র অত্যাচার নিয়ে বলা হয় -

> "এই আইনটী যখন হয় আমরা প্রাণপণে ইহার প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন আমাদিগের কথা রাজপুরুষদিগের ভালো লাগে নাই। কিন্তু এই আইনটী এক স্ত্রী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।"[২]

সম্বাদ ভাস্করে লেখা হয়েছিল -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "উক্ত আইনের কার্য নির্ব্বাহ জন্য লালবাজারে যেসকল ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষার ছলে নারীদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতেছেন, দূষ্যাদিগের অপেক্ষা নিদ্দোর্ষা বেশ্যাদিকের অধিক যন্ত্রণা হইতেছে।"[৩]

এই চৌদ্দ আইন নিয়ে সামাজিক পরিস্থিতি যখন তুঙ্গে; তখন সাহিত্যের পাতায় তার প্রভাব লক্ষ করা যায় নাটক, প্রহসন কিংবা পাঁচালি রচনায়। 'বাহবা চৌদ্দ আইন', 'বেশ্যা বিবরণ', 'বদমাএস জব্দ', 'ভারত দর্পণ নাটক', 'বেশ্যা গাইড', 'পাঁচালি কমলকলি' ইত্যাদি রচনাগুলি তখন জনসমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কালের আঘাতে বইগুলি যুগোত্তীর্ণ হতে না পারলেও এদের ঐতিহাসিক মূল্য যে অপরিসীম - তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাহবা চৌদ্দ আইন : অজ্ঞাত পরিচয় নাট্যকার ও প্রকাশকহীন নাটক 'বাহবা চৌদ্দ আইন' ১৮৬৯ সালে (বাংলা ১২৭৬ সাল) প্রকাশিত হয়। চৌদ্দ আইনের চিকিৎসা বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা নাটকের মূল উপজীব্য। নাটক শুরুর পূর্বে মুখবন্ধে দীর্ঘ বিবৃতি, ইংরেজ সরকারের শাসনকার্যের সুনাম এবং চৌদ্দ আইন প্রণয়নকে সাদরে অভিবাদন জানানো হয়েছে। কলকাতায় গণিকা বৃদ্ধি, অত্যাধিক গণিকা আগমনের কুফল এবং চৌদ্দ আইন প্রণয়নের পর তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা ইত্যাদি দীর্ঘ আলোচনামূলক ভূমিকার পর নাট্যকার নাটক শুরু করেন। বোঝা যায়, নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে চৌদ্দ আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করানোর চেষ্টা করেছেন।

নিস্তারিণী নাম্নী এক বারাঙ্গনার সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে নাট্যকাহিনি নির্মিত হয়েছে। চৌদ্দ আইনের পরীক্ষা দিয়ে আসার পর সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে নিস্তারিণীর বর্ণনায় -

> "পোড়া চৌদ্দ আইনের শ্রাদ্ধ কত্তে গেছিলাম, আর কোথায় যাব...আমাকে ধরে নেগ্যালে, সেখানে গে দেকি চারিদিকে পেয়াদা পাক গিস ২ কচ্চে, আর জোন দুচ্চার বাঙালি রয়েচে আগুতে দেখেই ভয়ে আমার বুক গুর ২ কত্তে লাগলো। মনে করি না জানি কি করে, আবার শুনেছি নাকি আরকের টবে বসায়, এই সকল ভাবনায় কাপড়ে ওকর্ম (মুতে ফেলা) করেচি। তাদের একজন এসে বল্লে তোর ব্যামো আছে? আমি ভয়ে কাঁপিতে ২ বলিলাম, না। পরে কহিল সরে আয় ... তখন বলিল না তোমাকে ন্যাংটো হইতে হইবে, যদি অধিক লজ্জা হয় তবে মুখে চকে কাপড় বাঁধো।"[৪]

যৌনাঙ্গের উপর অত্যাচার, রোজ রাতের বেশ্যাবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশি পীড়াদায়ক হওয়ায় নিস্তারিণী কান্নায় ভেঙে পড়ে। নাটকটি একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা হওয়ার কারণে নাটকীয় রীতি এখানে সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি। তাছাড়া, নাট্যকাহিনি সংক্ষিপ্ত এবং জনসাধারণের কাছে রুচিশীল না হওয়ার কারণে নাটকটি কখনো প্রদর্শিত হয়নি।

বেশ্যা বিবরণ : এই একই বিষয়কে উদ্দেশ্য করে বেশ্যা বিবরণ রচিত হয়েছিল। তারিণীচরণ দাস রচিত এই প্রহসনটি ১৮৬৮ সালে (বাংলা ১২৭৬ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল। চৌদ্দ আইনের ফলস্বরূপ বারাঙ্গনাদের কীরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং আইনের হাত থেকে বাঁচতে কীভাবে লুকিয়ে ফরাসি ঘাঁটি ফরাসডাঙ্গায় আশ্রয় নিয়েছিল - তার চিত্র ধরা পড়েছে এই প্রহসনের মধ্যে।

বারাঙ্গনাদের কিছু গান দিয়ে নাটকটি শুরু হয় এবং পরবর্তী অংশে স্বামী-স্ত্রী জ্ঞান এবং সুমতির কথোপকথনে নাটকের রূপনির্মিত হয়। এখানে সুমতি এবং জ্ঞান নামদুটি দ্যোতনাবাহক। বেশ্যাসঙ্গ করে জ্ঞান একসময় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই রোগ সুমতির শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে। সুমতি মহিলা চিকিৎসকের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হয়। সে মনে করে বেশ্যাদের এই যে বিষ যা পুরুষকে 'ডংশন' করলে শরীরে প্রবেশ করে তার সর্বনাশ ঘটায়, তা সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন। জ্ঞান বলে -

> "ওহাদিগে (অর্থাৎ বেশ্যাদের) নির্ব্বিশ করিবার জন্য নূতন বিধি হইয়াছে ওহাদের পরীক্ষা লইলে ওহারা নির্ব্বিশ হইবে অতএব পরীক্ষার ভয়ে ওহারা পলাইয়া আসিতেছে।"[৫]

সুমতি জ্ঞানকে স্মরণ করিয়ে দেয় -

> "সে বৎসর নাথ তোমাকেও ডংশন করিয়াছিল তুমিও বিষের জ্বালায় জাতনা বিস্তর পেয়েছিলে..."[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ, তারাও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই তারা রোগনির্ণায়ক চৌদ্দ আইনকে সমর্থন করেছে। অন্যদিকে, পচার মা নাম্নী এক গণিকার উক্তি -

"পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া মম সাধ্যে নয়।
সাধ্যে নারী নহি আমি হই ব্যাভিচারী।
কি রূপে পরীক্ষা দিব তাই ভেবে মরি..."[৭]

এই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা গণিকাপল্লীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পরীক্ষা দেওয়ার চেয়ে তাদের কাছে বেশ্যাবৃত্তি করা অনেক বেশি সহজ বলে মনে হয়। আবার, প্রেমিকদের স্বার্থপরতাও ধরা পড়েছে এই নাটকে। রাত্রে তাদের শয্যাসঙ্গী হলেও পরীক্ষাকালে কোনো প্রেমিক থানায় গিয়ে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাসটুকু দেয়নি। তাই দুঃখে গণিকা সুধামুখী বলে -

"সুখের কারণ সবে সঙ্গি হতে চায়।
বোঝা হইল যে দিন যাইয়ে থানায়।
সঙ্গেতে নাহি গেল পুরুষ একজন।
থানামধ্যে বেশ্যাগণ করিনু গমন।
সোহাগিনী আদরিণী বলে সবে কয়।
কিন্তু দিন সঙ্গের সঙ্গে কেহ নয়।"[৮]

অর্থাৎ, প্রেমিকের এই স্বার্থপরতা সুধামুখীর মনে আঘাত হেনেছে। শুধুমাত্র টাকার কাছে সম্পর্ক বাধা পড়েছে। এই ব্যাপারটিতে সুধামুখী বেশ মর্মাহত এবং পরিশেষে সে একেবারে স্পষ্টবক্তা হয়ে উঠেছে। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে চৌদ্দ আইনে শারীরিক উৎপীড়নের পাশাপাশি বারাঙ্গনাদের মানসিক অবসাদ, ভীতি, আশঙ্কা, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা এবং জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বদমাএস জব্দ : ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চ বটতলা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত রচিত 'বদমাএস জব্দ' প্রহসনটি। নাট্যকার গণিকাদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং সরকারের এই আইনকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। প্রহসনের সূচনাংশে উল্লেখিত হয়েছে -

> "কল্য ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রেল গত ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন অর্থাৎ বেশ্যা-দিগের রেজিষ্টারি ও গর্ম্মি রোগাক্রান্ত বেশ্যাদিগের চিকিৎসা করিবার আইন প্রচলিত হইবে।"[৯]

প্রহসনে দেখা যায়, আইন প্রণয়ন নিয়ে গণিকাপল্লীতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে। কেউ তার প্রেমিকের সঙ্গে বাক্যালাপে তার 'একজামিন' দিতে যাওয়ার দুঃখ করে, কেউ বা আতঙ্কে পল্লী ছেড়ে পালাতে শুরু করে। যৌনাঙ্গের উপর অত্যাচার এতটা কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে এরা কলকাতায় ইংরেজদের শাসনাধীন থেকে ফরাসডাঙ্গায় ফরাসিদের আশ্রয়ে উঠে এসেছিল।

> "... দেখতে ২ বেশ্যাপল্লী খালি হয়ে পোল্লো সব পালাতে আরম্ভ করেছে চন্দননগরে বদমাএসদের দিগুনতর বদমাএসী বেড়ে উঠলো এবং কলিকাতার বদমাএসেরা মৃতপ্রায় হল..."[১০]

মূলত কলকাতার ঠগ, জোচ্চোরদের এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ, প্রথমদিকেই লেখক উল্লেখ করেছেন -

> "নিছক রাঁড়েরা জব্দ হবে না লোচ্চাদের জব্দ কর্ব্বার জন্যই হয়েছে এর নাম তো চৌদ্দ আইন নয়, বদমাএস জব্দ আইন।"[১১]

সবশেষে একটি দীর্ঘ কবিতা বারাঙ্গনার মুখসংলাপে বসিয়ে প্রহসনটি সমাপ্ত হয়েছে, তার দীর্ঘ বিলাপের মধ্যে রয়েছে তার দীর্ঘদিনের স্থায়ী ব্যবসার চূড়ান্ত পরিণতি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধোঁয়াশা।

"বেশ্যাগণ ভাবে কর অর্পিয়া মাথায়।
হায় কি হইল মোরা যাইব কোথায়।।
...
কি দোষে বা দোষী মোরা রাজার নিকট।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমাদের প্রতি কেন আইন বিকট।।
নাহি পুত্র নাহি পতি নাহি পিতা মাতা।
নীচ বৃত্তি প্রতিবাদ সাধল বিধাতা।”[১২]

একটি বড়ো ব্যবসায়িক অবস্থার কী ভয়ংকর পরিণতি। ‘একজামিন’-এ পাস করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়- তার উপর অকথ্য শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তাদের মুখে বাক্যবাণ ফুটিয়েছে।

ভারত দর্পণ : এই নাটকটিও চৌদ্দ আইনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। চৌদ্দ আইন শুরু হওয়ার চার বছর পর অর্থাৎ ১৮৭২ সালে নাটকটি রচনা করা হয়। সুতরাং, চৌদ্দ আইনের ফলাফলস্বরূপ তৎকালীন কলকাতার অবস্থাচিত্রের একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

‘একজামিন’ দেওয়া শুধু নয়, একজামিনে পাশ করতে না পারলে হাজতবাস এবং শারীরিক অত্যাচারের কথা ভেবে তারা আতঙ্কিত হয়। অবশ্য টাকা দিয়ে হাজতবাস থেকে মুক্তিলাভের একটা বিষয় যেমন এখানে লক্ষ করা যায়, পাশাপাশি ব্যবসায় ভাটার কারণে সেই টাকার অভাব, বারাঙ্গনা শ্রেণির অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের বিষয়টি চিহ্নিত করে। এমনকী প্রেমিক হয়ে যারা গণিকাদের বাড়িতে থাকত; তাদের দুঃসময়ে কেউ এগিয়ে এসে তাদের সহায়তা করেনি; ফলে প্রেমিকদের একটি স্বার্থপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও এই নাটকে ফুটে উঠেছে। নাটকের একটি চরিত্র শারদাসুন্দরী বর্ণনা দিয়েছেন একজামিনের ভীতি ঠিক কেমন -

“কি কাল হইল মম এ চৌদ্দ আইন
দিন ২ ভেবে মম তনু হলো ক্ষীণ
...
যে ব্যাধি হয়েচে তাহে কেমনে তরিব।
একজামিন্ দিতে হলে প্রাণে যে মরিব।।
নিশ্চয় ফটকে মোরে আটক করিবে।
তখন আমার দশা হায় কি হইবে।।”[১৩]

শারদাসুন্দরী জানে এই রোগ তার শরীরে বাসা বেঁধেছে। একজামিনে তা ধরা পড়বে; আর ধরা পড়লেই জেল হেফাজতে দেবে। প্রেমিককে চিকিৎসা করার কথা বললেও তাতে কোনো লাভ হয়নি। তাই পদ্যাংশে ধরা পড়েছে তার আর্তনাদ। আর্থিক দিক দিয়েও তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা বোঝা যায় বারাঙ্গনাদের নিজস্ব সংলাপে -

> “কামিনী - ... আজ যে তুমি হেঁটে একজামিন দিতে যাচ্চ?
> কুসুম - হেঁটে কি আর যেতে নেই? কত পথই বা? আর ডাক্তারকে মিছে আট টাকা কোরে মাসে ২ দিতে পারিনে, তাই হাঁসপাতালে গিয়ে একজামিন দিয়ে আসি, এখন খরচ যত কমাতে পারি, সেই চেষ্টায় হয়েছে। ...
> জ্ঞান - তারপর শুনলেম একজামিনেতে ধরা পোড়ে ডাক্তারখানায় আটক আছে, আরও শোনা গ্যাল যদি জরিমানার দশ টাকা দিতে না পারে, তা হ’লে আরাম হয়ে আবার পোনেরো দিন জেল খাটতে হবে।”[১৪]

সুতরাং, এই আর্থিক চাপ, মানসিক সংকট, শারীরিক উৎপীড়ন, রোগীর ক্রমহ্রাসমান খদ্দের - এ সমস্ত বিষয়ই কলকাতায় গণিকাদের জীবনধারণে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

বেশ্যা গাইড : ‘বেশ্যা গাইড’ কোনো প্রহসন না নাটক নয়; বলা যেতে পারে চৌদ্দ আইনের নিয়মাবলি সম্মিলিত একটি চটি পুস্তিকা। এখানে ৩৩টি নিয়ম সূত্রাকারে নির্দেশিত হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদে লেখা ছিল ‘বেশ্যা গাইড অর্থাৎ স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থে ১৮৬৮ সালের চৌদ্দ আইন তথা এই আইন সংক্রান্ত আফিস বন্দোবস্ত ও কার্য্যবিধি বিষয়ক’। অর্থাৎ, বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়মাবলীর সংগ্রাহক ছিলেন শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ১২৭৫ সালে কেদারনাথ দে কর্তৃক বইটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাহেবের আদেশানুসারে যে চার্জশিট প্রস্তুত করা হয়েছিল, তার নিয়মাবলি ৩৩টি সূত্রে পরিবেশিত হয়। কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং কাদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে তার একটি তালিকা এখানে প্রস্তুত করা হয়। যেমন -

১. রেজিস্ট্রেশন না করে কেউ বেশ্যাবৃত্তি করতে পারবে না।

২. প্রত্যেক থানার ইন্সপেক্টর সেই অঞ্চলের বেশ্যাদের রেজিস্ট্রেশন করার কাজটি করবেন।

৩. বেশ্যাবৃত্তি করতে চাইলে নামসহ সমস্ত নথি থানায় জমা দিতে হবে।

৪. কোনো বেশ্যা তার বাসস্থান পরিবর্তন, বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ইত্যাদি করতে চাইলে কমিশনারকে ইংরাজি চিঠি দিতে হবে এবং চূড়ান্ত হুকুম অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

৫. সময় মতো থানায় হাজিরা দেওয়া এবং রেজিস্ট্রেশন টিকিট দেখানো ইত্যাদি বিষয়গুলি থানার ইন্সপেক্টরকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. কোনো বেশ্যা নোটিসের সময় মতো হাসপাতালে না গেলে উক্ত বেশ্যাকে ধরে এনে হাসপাতালে ভর্তি করার কাজটি করতে হবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সেখানে উল্লেখিত রয়েছে। এছাড়া নোটিশ ফর্মের একটি দৃষ্টান্ত এবং আইন অমান্য শাস্তিগুলি ধারা আকারে সজ্জিত আছে। রেজিস্ট্রেশন টিকিটের ফর্মও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। এইভাবে ‘বেশ্যা গাইড’ বইয়ে আইন বিষয়ক একটি সম্পূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন এবং তা বিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঁচালি কমলকলি : ১৮৭২ সালে পাঁচালি আকারে প্রকাশিত হয় শ্রী অঘোরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ‘পাঁচালি কমলকলি’ নামক একটি গ্রন্থ। এই প্রথম সংবাদপত্রে লেখালেখি, নাটক, প্রহসন ছাড়িয়ে পাঁচালিকারেও চৌদ্দ আইনের বিস্তারিত বর্ণনা ধরা পড়েছিল। যেহেতু পাঁচালি, গান ইত্যাদি বিষয়গুলি উনিশ শতকে বিখ্যাত ছিল এবং একটা বড়ো অংশের মানুষের কাছে সহজে প্রবেশ করতে পারত; তাই লেখক পাঁচালিকারে রচনা করলেন ‘পাঁচালি কমলকলি’।

সূচনাংশে যে গীত রয়েছে সেখানে অঘোরচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং নিজের নাম ভণিতায় রেখে রাজ্যশাসক মহারাণীর নিকটে কাতর অনুনয় করেছেন -

> “মরি মরি কি চিকন বুদ্ধি, দেখে গরমী রোগের বৃদ্ধি, হদ্দ চৌদ্দ আইন জারি করেছেন; অঘোরচন্দ্রের এই বাণি, কোথা গো মহারাণী, তোমার ভারতভূমের প্রজারা মা দুঃখে কেউ আর সবে না।।”[১৫]

এরপর চৌদ্দ আইনের পরীক্ষা সংক্রান্ত যে ভীতি, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে। গোমস্তার যেমন কাগজের হিসেব নিকেশের ভাবনা হয়, তহবিলদারের তহবিল মেলানোর যে ভাবনা কিংবা ইন্দ্র যেমন গৌতমের সাড়া পেয়ে ভাবনায় পড়ে যায় - এরকম আরও অনুসঙ্গ উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন তেমনি সোনামণি নাম্নী গণিকার ঘরে পুলিশ ঢুকলে পরীক্ষার ভয়ে তার ভাবনার অন্ত থাকে না। পরবর্তীতে দেখা যায় কলকাতায় পরীক্ষার ভয়ে গণিকারা ফরাসডাঙ্গায় ফরাসিদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে -

> “এই রূপেতে যাচ্ছে সবে করি দড়াদড়ি।
> ফরেশডাঙ্গায় হয়েছে কেমন রাঁড়ের ছড়াছড়ি।।
> আনাচে কানাচে রাঁড় রাঁড়ময়ই সব।
> ফরেশডাঙ্গায় যত ছোঁড়াদের বাড়িল উৎসব।।
> আহ্লাদে আটখানা যত কি বুড় কি ছোঁড়া।
> কাঁকুড়ফাটা হয়ে উঠলো ছিল যত গোঁড়া।।”[১৬]

ফরাসডাঙ্গায় বুড়ো থেকে ছোকরা সকলেই এখন ইচ্ছেমতো রাঁড়ের ঘরে ঢুঁ মারে কিন্তু তাতে পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। পেটের খাবার জোগাতে তাদের প্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। রোজগার এত কম হওয়ায় তারা কেউ কেউ কলকাতায় ফিরে যেতে চায়, কষ্টসাধ্য পরীক্ষা দিতে চায়, কেউ আবার আর কয়েকটা দিন সহ্য করে থাকার পরামর্শ দেয়। অন্যদিকে কলকাতায় থাকা গণিকারা থানার লোকেদের ভয়ে এদিকে ওদিকে পালিয়ে বেড়ায়; কারণ ধরা পড়লে রুলের গুঁতো, একজামিন দেওয়া

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- সেসব ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে আঁতকে ওঠে। গণিকারা একরকম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজেদের পেশা পরিবর্তনের ছল করে একজামিনের হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল।

"এর মধ্যে কত মাগী, যারা অতি শিয়ানা ঘাগি,
বেরুচ্ছে সব বহুরূপী হয়ে।
দুদিক বজায় রয়, পরীক্ষা না দিতে হয়,
প্রেমের খেলাও নাহি যায় বয়ে।।"[১৭]

তাই গণিকারা কখনো আবার নিজে বৈষ্ণবী সেজে এবং প্রেমিককে বৈষ্ণব সাজিয়ে পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে চায় -

"নাকে তিলক রসকলি, উদয় যেন ঘোরকলি
প্রাণের অলি রাখছে ছলছলে।।
এরূপ করি নিরীক্ষণ কি বোলবেন আর সার্জন,
বলিবার তো কিছু নাই উপায়।।"[১৮]

শুধু কি ফরাসডাঙ্গা? গণিকারা এই যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে কাশী, বেনারস, কেউ বা প্রয়াগক্ষেত্রে পালিয়ে গিয়েছিল। পাঁচালিকার অঘোরচন্দ্র ঘোষ বলেছেন -

> "সোনাগাজী মেছোবাজার শূন্যাকার, দেখে শুনে লোক করে হাহাকার। কোথা গেল সেসব বারেন্ডার বাহার..."[১৯]

উনিশ শতকের চৌদ্দ আইনের ঠেলায় গণিকাপল্লী একেবারে প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। কলকাতা জুড়ে তাদের দাপট মোমবাতির শিখার মতো নিভিয়ে আসে। তাদের পরিস্থিতির দুঃখ দৈন্যতার ছবি লক্ষ করি এই কাওয়ালি তালের গানে -

> "একজামীন সুরু হয়েছে, বাড়িতে নুটিস দিয়েছে, পুলিষে হাজির না হলে মরবে শমনে। ঝমঝম শব্দ মলে, গামছা কান্ধে দলে দলে, হেসে গঙ্গাস্নানে চলে, আর একটি দেখিনে।।"[২০]

অর্থাৎ তাদের নিজস্ব যে একটা ধারা ছিল - একসঙ্গে স্নানে যাওয়া, গল্প করা; চৌদ্দ আইনের বিভীষিকাময় থাবায় সেই বন্ধন ভেঙে গেছে। প্রকাশ্যে আর কেউ বের হয় না, সকলের মনে ভীতি; ত্রস্ত হয়ে থাকে সর্বদা। তাছাড়া, ফরাসডাঙ্গা থেকে কলকাতা ফিরে গেলে মানসম্মান হননের দুঃখ ইত্যাদি নানারকম সমস্যায় গণিকারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

সবশেষে, অঘোরচন্দ্র ঘোষ কুলবধূদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছেন যে গণিকাদের দুর্দশা এখন চরমে, সুতরাং কোনো গৃহবধূ যেন এই গণিকাবৃত্তির কথা ভুলেও না ভাবে- সেই সাবধানতা জারি করেছেন।

"কুল-নারী গণে বলি, করি আমি কৃতাঞ্জলি,
কুলে দিতে জলাঞ্জলি, করো না মনন।
বেশ্যাপথে এই ভোগ, ধাতচালা বাওরোগ
তাহে পরীক্ষারো ভোগ, ধাতচালা গমন।"[২১]

তৎকালীন সময়ে বাড়ির মেয়ে বউরা দল বেঁধে পাঁচালি গান শুনতে আসত। তাই পাঁচালিকার চেয়েছিলেন পাঁচালি গানের মধ্যে দিয়ে চৌদ্দ আইনের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আসলে উনিশ শতকে শারীরিক আত্মতৃপ্তি পাওয়ার ইচ্ছায় অনেক হিন্দু উচ্চবাড়ির মেয়েরা স্বইচ্ছায় গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৩ সালে কলকাতায় গণিকার সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯। ১৮৬৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-তে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন মূলত সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ থেকে বের হয়ে নিজের আনন্দ উপভোগের জন্যই তারা এই পথ বেছে নিত। তাই, পাঁচালিকার চেয়েছেন এই ধরনের মনোবৃত্তি যেন কারোর না থাকে; নইলে গণিকাদের মতো তাদেরও দুর্দশার শেষ থাকবে না।

সরাসরি চৌদ্দ আইন নিয়ে রচিত না হলেও বেশ্যানুরক্তিকে কেন্দ্র করে অনেক নাটকে আমরা চৌদ্দ আইনের ভয়ানক পরিণামের কথা পাচ্ছি। যেমন - 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' নামক একটি নাটকের সংলাপে এই নিয়ে আলোচনা লক্ষ করি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কেদার। ... দেখ ভাই গরিব দুঃখির কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি বড় বড় লোকের মধ্যেও স্ফুর্ত্তি নাই, অনেকেই হাত খাট করেছেন, আজ কাল সন্ধের পর গলিঘুজি অন্ধকার।
> প্রিয়। ওটা ত আমাদের পক্ষে মঙ্গলেরি বিষয়, কিন্তু ওর অন্য কারণ আছে, চোদ্দ আইন। এই আইনের ভয়ে অধিকাংশ বেশ্যা কলিকাতা পরিত্যাগ করেছেভাই এই অভাবের দরুণ বেশ্যার বাজারত মাহার্ঘ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ঐটি বিপরীত দেখা যাচ্চে।
> কেদার। বিপরিত কিসে, লোকে নাম লেখাতে না পারলেত আর বেশ্যালয়ে বেড়াতে যাবে না, কাযে এদিকে যেমন পুলিসের টানাটানি, ওদিকে তেমনি কম আমদানি, আর তোমার পক্ষে বাজার মাহার্ঘ্যই কি আর সস্তাই কি? সন্ধের পর তাঁর ওখান থেকেত এক পা বেরবার যো নাই, ছুঁড়ি আচ্ছা ফাঁদে ফেলেচে, একেবারে গ্রাস করে বসেছে।"[২২]

চৌদ্দ আইন চালু হওয়ার পর থেকেই গণিকাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলতে থাকে। অত্যাচার শুধু গণিকাদের উপরেই থেমে থাকেনি; বাইজি, নৃত্যশিল্পী, গীতশিল্পীদেরও পরীক্ষার জন্য পুলিশ ধরে নিয়ে যায়; এমনকী উত্তর কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের কাছাকাছি থাকা গৃহবধূদেরও জোরজবরদস্তি তুলে নিয়ে যায়। আইনের হাত থেকে রক্ষা পেতে গণিকারা আত্মহত্যা করতে শুরু করে। ১৮৬৯ সালের ৩১ মে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পত্রে লেখা হচ্ছে গণিকাদের চৌদ্দ আইন থেকে মুক্তি দেওয়ার ভরসা দিয়ে কোনও কোনও পুলিশ কর্মচারি এবং ডাক্তার গোপনে অর্থ গ্রহণ করছে। তাছাড়া, আইনের নামে অত্যাচারের বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছায়।

এই আইন জারি করার সময় কলকাতায় ১৯.২% সৈন্য এই রোগের শিকার ছিল। ১৮৭০ সালের দিকে তা কমে ১৩.৬% তে দাঁড়ায়। কিন্তু কিছুদিন পর আবারও যৌন রোগের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ফলে আইনের ব্যর্থতা খুব সহজেই চোখে পড়ে। অন্যদিকে আইনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হতে থাকে, পত্র-পত্রিকাগুলিতে এর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে এই আইন বন্ধ করার জন্য ইংল্যান্ডে Ladies National Association-এর নেত্রী Josephine Butler-কে চিঠি লিখে কলকাতায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করেন। ১৮৮৩ সালের ১৫ই মার্চ সরকারের তরফে কলকাতা থেকে এই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কেউ কেউ এই আইন চালু রাখার প্রস্তাব দিলে ১৮৮৪ সালে ২০ সেপ্টেম্বর আইন পুনঃস্থাপন করা সম্ভব নয় বলে সরকারি মতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরও কিছু কিছু ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে এই আইন চালু ছিল। ১৮৮৮ সালে Ladies National Association-এর পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের শাসক সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়, যাতে লেখা ছিল -

> "We, as a Women, desire to protest in the strongest and most solemn manner possible against the wrong done to our sisters and fellow subjects in India."[২৩]

এরপর ১৮৮৮ সালে চৌদ্দ আইন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাছাড়াও, কিছু মানুষ যারা প্রথমে চৌদ্দ আইনকে সমর্থন জানিয়েছিল, তারাও প্রতিবাদ করতে শুরু করে। কারণ, আইনের নামে পুলিশ নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে।

১৮৬৮ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর চৌদ্দ আইনের বিভীষিকাময় চেহারা কলকাতার গণিকাপল্লী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মহিলাদের জীবন অতীষ্ট করে তুলেছিল। পরীক্ষার নামে রুলের গুঁতো এবং পরীক্ষায় শারীরিক অত্যাচার ও জীবননাশের আশঙ্কা গণিকাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ১৮৮৮ সালের পর আবার তারা ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ জীবনে ফিরে আসে। গণিকাদের নির্মম পরিণতি বটতলার নাটক, প্রহসন বা চটি বইগুলি যতটা জীবন্ত করে তুলে ধরেছিল, তা ভারতীয় সরকারী নোটিশপত্রে কোনোদিনই ধরা পড়েনি। কারণ, বটতলার অনেক লেখকই ছিলেন নিচুতলা থেকে উঠে আসা মানুষ কিংবা সোনাগাছির খদ্দের। তাই, গণিকাদের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি এরা অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন আর লিখেছেন তাদের জীবন আলেখ্য - তাদের মর্মপীড়ণ। চৌদ্দ আইন বন্ধ হয়ে গেলেও তৎ-সংক্রান্ত বটতলার সাহিত্য পুস্তিকাগুলি আজও বর্তমান। তার সাহিত্যমূল্যকে অগ্রাহ্য করতে পারেন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন; কিন্তু গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খর্ব করার সাহস তাঁদের নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 714 - 722
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ১৭ জুন, ১৮৭২
২. তদেব, ১৭ জুন, ১৮৭২
৩. সম্বাদ ভাস্কর, ২০ এপ্রিল, ১৮৬৯
৪. 'বাহবা চৌদ্দ আইন', কলকাতা, মির্জাপুর হলএলস লেন নং ২ প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, সং বৎ ১২৭৬
৫. বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পাদিত, বটতলার বই উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য কুড়িটি বই, গাঙচিল, মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৭৬
৬. তদেব, পৃ. ১৭৬
৭. তদেব, পৃ. ১৭৭
৮. তদেব, পৃ. ১৭৯
৯. তদেব, পৃ. ১৮৪
১০. তদেব, পৃ. ১৮৯-১৯০
১১. তদেব, পৃ. ১৮৬
১২. তদেব, পৃ. ১৯০-১৯১
১৩. দত্ত, শ্রীপ্রিয়লাল ও শীল শ্রীললিতমোহন প্রণীত, 'ভারতদর্পণ নাটক, কলকাতা, মির্জাপুর হলওয়েলস লেন ২ নং ভবনে প্রাকৃত যন্ত্রে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, শকাব্দ ১৭৯৪, পৃ. ৯
১৪. তদেব, পৃ. ২৮
১৫. বিশ্বাস, মৌ সম্পাদিত, বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ, রত্নাবলী, ১১এ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ, মে, ১৯৯৯, পৃ. ৭৭
১৬. তদেব, পৃ. ৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ৮৯
১৮. তদেব, পৃ. ৯০
১৯. তদেব, পৃ. ৯২
২০. তদেব, পৃ. ৯৪
২১. তদেব, পৃ. ১০৩
২২. তদেব, পৃ. ৩১-৩২
২৩. Antoinette Burton : Burdens of History, The University of North Carolina Press, USA. 1994, পৃ. ১৩১-১৪৮